আইনের শাসন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খাইরুল হক

বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ও ৪ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতা লাভ করে। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ তারিখে এই সংবিধান বলবৎ হয়। এর ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ২৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা হতে সংবিধান বলবৎ পর্যন্ত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানগুলি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারাগ্রাফে আইনের শাসনের অঙ্গীকার রয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদ বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছে। সপ্তম অনুচ্ছেদ সংবিধানের প্রাধান্য ঘোষনা করেছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষনা করেছে; তৃতীয় ভাগ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিধান করেছে। এই ভাগের ২৬ অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। ষষ্ঠ ভাগ সুপ্রীম কোর্টসহ একটি বিচার বিভাগ স্থাপন করেছে। সপ্তম ভাগ একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন স্থাপন করেছে। আইন ও আইনের শাসন প্রক্রিয়া উপর্যুক্ত প্রতিটি ভাগের প্রতিটি অনুচ্ছেদে প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। তবে সংবিধান ও আইনের বইতে আইন ও আইনের শাসনের কথা লিপিবদ্ধ থাকা এক জিনিস আর ঐ সকল মহান বিধান রাষ্ট্রের বাস্তব প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হওয়া সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা ও অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়। ২০ আগস্ট সামরিক শাসন জারি ইত্যাদি সবই সংবিধান ভঙ্গ করে করা হয়েছিলো, এই সকল ঘটনা ছিলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি, মহান সংবিধান এবং সংবিধানে ব্যক্ত সকল বিধান থাকা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঘটেছিলো। এখানেই শেষ নয়, দেশের রাষ্ট্রপতি ও তাঁর পরিবারের প্রায় সবাইকে যারা হত্যা করলো তাদেরকে যেন বিচারের সম্মখীন হতে না হয় সেজন্য তদানীন্তন শাসকগণ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে Indemnity Ordinance (ord.No of ১৯৭৫) মারফত বিচারের পথ বন্ধ করে তথাকথিত আইন করে আইনের শাসনের পথ বন্ধ করে। এই রাষ্ট্র ছিলো তখন একটি ঃ Otalitarian বা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে আইনের শাসন কথাটিই ছিলো এক নিদারুণ রসিকতা। ২ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে দিবাগত গভীর রাতে কিছু সংখ্যাক সশস্ত্র ব্যক্তি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপস্থিত হয়ে কারাগারের প্রধান ফটক ও অন্যান্য ফটক খোলার হুকুম দেয়। উল্লেখ্য, রাতে কোন অবস্থাতেই ফটক খোলা যায় না, অধিকন্তু তাদের কাছে ফটক খোলার কোন লিখিত অনুমতি পত্রও ছিলো না। কারাগার কর্তৃপক্ষ প্রথমে ফটক খুলতে অস্বীকার করলেও পরে বঙ্গভবন থেকে (তাদের বক্তব্য অনুসারে) নির্দেশ পেয়ে তারা সশস্ত্র ব্যক্তিদের দাবিমতো ফটক খুলে দেয়। তৎপর তারা বাংলাদেশের চার প্রথিতযশা নেতাকে খুন করে চলে যায়। দুর্ভাগ্যজনক এই কারণে যে মৌখিক নির্দেশ তা যারাই হোক না, কারাগার কর্তৃপক্ষ তা মানতে একেবারেই বাধ্য ছিলেন না, তারা বরঞ্চ যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকে ফটক খুলতে পারেন না, তা সত্ত্বেও আইন ভঙ্গ করে তারা ফটক খোলেন। এভাবেই তারা আইনের শাসন ভঙ্গ করেন এবং ফলশ্রুতিতে জাতি তাদের চারজন নেতা হারালো এবং দেশ আবারো কলঙ্কিত হয়।

তিন ব্যক্তি সংবিধান ভঙ্গ করে পর পর দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন। প্রথমদিকে এক পুতুল সংসদ ছিলো। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সেই সংসদও বাতিল করলেন। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি এক 'হ্যাঁ-না' ভোটের মাধ্যমে নিজের গদি পাকাপোক্ত করলেন। সেই সময় সংবিধান ভঙ্গ ও আইন ভঙ্গ ও আইনের শাসন ভঙ্গের প্রতিযোগিতা চলছিলো। ব্যাপারটা চূড়ান্ত পর্যায়ে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে যখন নতুন নির্বাচিত সংসদ অধিবেশনের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ তারিখ থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সকল অবৈধ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপের বৈধতা পঞ্চম সংশোধনী আইনের মারফত প্রদান করে। তৎপর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি এক ঘোষণা মরাফত পরদিন ৭ এপ্রিল তারিখে সমরিক শাসন প্রত্যাহার করেন। সংসদ সংবিধানের আওতায় সংবিধানে ব্যক্ত কার্যাবলি করতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও অবৈধ রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যের বৈধতা দিতে পারে না, যা অবৈধ তা অবৈধই থাকবে। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো ২৪ মার্চ ১৯৮২ তারিখে। তদানীন্তন সেনাপ্রধান সংবিধান ভঙ্গ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন, সামরিক শাসন জারি করেন, চার বছর ধরে সামরিক শাসন চালু থাকে। সামরিক আদালত প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেয়। সামরিক শাসন চার বছর চলার পর তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন হলো। আবারও জনগণকে ধোঁকা দিয়ে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে চার বছরের অবৈধ কার্যকলাপের বৈধতা প্রদান করা হলো। এভাবেই স্বৈরশাসন তাদের আজ্ঞাবহ সংসদকে দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সাথে এবং দেশের সংবিধানের সাথে প্রতারণা করলো (committed fraud upon the people of Bangladesh)।

আইনের শাসনের কথা শুধু সংবিধানের পাতায় লেখা থাকলেই হয় না, মুক্তির কথা, স্বাধীনতার বাণী আইনের শাসন জনগণের আত্মায় যতক্ষন না প্রোথিত হচ্ছে, ততক্ষন পর্যন্ত কোনো সংবিধানই তাদের অধিকার হাতে উঠিয়ে দেবে না, সংবিধানে আইনের শাসনের কথা লেখাই থাকবে তাদের ন্যায় বিচার দেবে না। কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মচারী যদি ফৌজদারি অপরাধ করে তাকেও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। সকলকেই মনে রাখতে হবে, ভয় পেতে হবে যে আইন ভঙ্গ করলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে।

উপরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে, কারণ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আইন ভঙ্গকারীকে, তিনি যতো বড়ো শক্তিশালী ব্যক্তিই হোন না কেন, একই আইনের বিধান অনুসারে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই আইনের বিধান অনুসারে একই আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে একই পদ্ধতিতে শাস্তি পেতে হবে, তবে অপরাধ প্রমাণিত না হলে মুক্তি পাবে। যদিও আইন ভঙ্গকারীকে আদালতে বিচারক বিচার করে আইনের শাসন সমুন্নত করবেন কিন্তু তিনি যদি নিজেই আইন ভঙ্গ করেন বা অপরাধ করেন তবে আইনের শাসন তাকেও ক্ষমা করবে না। আইনের মানদণ্ডে তারও বিচার হবে। বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে একই বিধান। মনে রাখতে হবে যে অপরাধী যদি কারো ক্ষতি করে বা কারো বিরুদ্ধে অপরাধ করে, সে যেন মানব জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করলো। এখানেই আইনের শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের Minnesota-তে demonstration (প্রতিবাদ) চলাকালীন জনৈক George Floyd কে Derek Chauvin নামে একজন পুলিশ কর্মকর্তা হাটুর নিচে তার ঘাড় চেপে রাখার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। বিচারে Derek Chauvinএর সাড়ে বাইশ বছর জেল হয়। তাছাড়া, Minneapolis কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৭ মিলিয়ন ডলার Floyd পরিবারকে প্রদান করে। একেই বলে আইনের শাসন। আমাদের দেশেও অনেক সময় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পুলিশের হেফাজতে আসামীর মৃত্যু ঘটার সংবাদ পাওয়া যায়। তাছাড়া, নিপীড়ন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের অভিযোগ শোনা যায়। অথচ, এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে যা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মানতে বাধ্য, অন্যথায় তারা আইন ভঙ্গ করবেন, আইনের শাসন ভঙ্গ করবেন। অনেকে বলেন যে এছাড়া আসামীকে বিচারের সম্মুখীন করা দুরূহ। কিন্তু , এ কোনো যুক্তি হতে পারে না। কোনো কারণেই আইন ভঙ্গ করা যাবে না। প্রয়োজনে অধিক সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে, তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তাদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে তাদের সঠিকভাবে অর্থবহ তদন্ত করতে হবে, কিন্তু জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় যদি করা হয়, নিরুৎসাহিত করতে হবে, কারণ, প্রথমতঃ ইহা আইনের শাসন পরিপন্থি, দ্বিতীয়তঃ অন্য কোনো স্বাধীন সাক্ষ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র দোষ স্বীকারেক্তির উপর ভিত্তি করে আদালত খুব কম ক্ষেত্রেই সাজা প্রদান করে।

এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় মামলা দায়ের হতো, তাঁকে নানান জায়গায় ছুটে ছুটে জামিন নিতে হতো, এইভাবে তিনি নিজেও ক্রমাগত আইনের শাসন ভঙ্গের শিকার হতেন, যাতে অন্য কেউ আইনের শাসন ভঙ্গের শিকার না হয়, সে কারণেই হয়তো আমাদের মহান সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই আইনের শাসনের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২ তারিখে যখন তিনি সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে এসেছিলেন তখন 'আইনের শাসন' কায়েম করার ওপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই আইনের শাসনের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। কারণ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ছিলেন জনগণের একচ্ছত্র নেতা, তিনি তাদের কষ্টের কথা নিজের অন্তরে ধারণ করতেন এবং সে কারণেই তিনি আইনের শাসনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।আমাদেরও উচিত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বীকৃত আইনের শাসনে বিশ্বাস করা। অন্তরে ধারণ করা।

উল্লেখ্য, আইন হচ্ছে, রায়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে দায়রা জজকে আইনের বিধান অনুসারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে নথি পাঠাতে হয়। সেই বৃটিশ আমল থেকে দায়রা জজগণ কঠোরভাবে এই আইন পালন করে আসছেন। উদ্দেশ্য হলো, হাইকোর্ট বিভাগ যেন সংশ্লিষ্ট Death Reference টি দ্রুততম সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুনানি করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আটশত এর অধিক Death Reference শুনানির অপেক্ষায়, কত শত আসামি Condemned cell এ বছরের পর বছর ফাঁসিতে মৃত্যুর অপেক্ষায়। এর থেকে অমানবিক ঘটনা আর কি হতে পারে। মৃত্যুর জন্য Condemned cell এ অপেক্ষমান আসামীদের নিকট আইনের শাসন কথাটি হাস্যকর। তেমনিভাবে যদি কোনো বিচারক আইনানুগ কারণ ব্যতিরেকে কোনো মোকদ্দমা শুনানি করতে অনীহা প্রকাশ করেন, বা আংশিক শ্রুত মোকদ্দমা শুনানি সম্পন্ন করতে অহেতুক বিলম্ব করেন বা শুনানি শেষে রায় না দিয়ে মাসের পর মাস ফেলে রাখেন তাহলে আইন ভঙ্গ হয় কিনা জানিনা, কিন্তু অবশ্যই আইনের শাসন ভঙ্গ হয়। তবে এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে দেশের জনগণকেও সজাগ থাকতে হবে, যেমন এথেন্সের জনগণ তাদের ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যকলাপের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতো, তারা জানতো eternal vigilance-ই শুধু তাদের অধিকার সমুন্নত রাখতে পাবে, অন্যথায় নয়। এ কথা সকল যুগে সকল দেশেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে Kangaroo court এ বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা ছিলো আইনের শাসন ভঙ্গের এক চরম লজ্জাজনক উদাহরণ।

শেষ কথাঃ যে পদ্ধতিতে ধনী-দরিদ্র, শক্তিশালী-দুর্বল, প্রভাবশালী-অক্ষম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলের উপর সমভাবে, একই মানদণ্ডে আইনের প্রয়োগ হয়, সেই পদ্ধতিকেই বলে আইনের শাসন

#

২৭.০১.২০২২ পিআইডি ফিচার